সীরাতে নববী

আরকাম ইবনে আবুল আরকামের গৃহঃ

এই সব নির্যাতনের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদেরকে তাদের ইসলাম কথায় ও কাজে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম তাদের ইসলাম, ইবাদত ও দাওয়াতকে গোপন করে রাখতেন।

তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দাওয়াত, ইবাদাত মুশরিকদের মাঝে প্রকাশ করতেন। কিন্তু মুসলমানদের সাথে গোপনে মিলিত হতেন। তাদের এই সম্মেলন আরকাম বিন আবুল আরকামের ঘরে হত। আর তা ছিল সাফা পর্বতের সন্নিকটে। তার ঘরে সম্মেলন এ জন্যই করতেন কারণ তা আল্লাহ্ দ্রোহী ও তাদের বৈঠক হতে দুরে অবস্থিত ছিল।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম রক্তপাতঃ

নবী (সাঃ)এর সাহাবীগণ পাহাড়ের পাদ দেশে একত্রিত হয়ে তথায় নামায আদায় করতেন। এক দল মুশরিক তাদেরকে দেখে ফেলল। তারা মুসলমানদেরকে গালাগালি করল। এতে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস তাদের একজনকে আঘাত করলে সে নিহত হল। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম রক্তপাত।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতঃ

নবুওতের চতুর্থ বছরের শেষের দিকে নির্যাতনের সুত্রপাত ঘটে এবং পঞ্চম সনের মধ্য দিকে উহা প্রকট আকার ধারণ করে। তাঁরা এই নির্যাতন থেকে পরিত্রান পাওয়ার চিন্তা করতে থাকলেন। এসময় মুশরিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সূরা কাহাফ নাযিল হয়। তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট ঈঙ্গীতসহ তিনটি প্রসিদ্ধ ঘটণা। আসহাবে কাহাফের ঘটনা দিক নির্দেশনা প্রদান করে যে, দ্বীনের ব্যাপারে ফিৎনায় লিপ্ত হওয়ার ভয়ে কুফরী রাষ্ট্র ত্যাগ করে হিজরত করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا﴾

অর্থঃ "তোমরা যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে পৃথক হলে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর তোমাদের পালন কর্তা তোমাদের জন্যে রহমত বিস্তার করবেন। আর তোমাদের জন্য তোমদের কাজ-কর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।" (সূরা কাহাফঃ ১৬)

অনুরূপ ভাবে মূসা (আঃ)এর সাথে খিজির (আঃ)এর ঘটণা একথা বুঝায় যে, ব্যহ্যিক অনুপাতে সব সময় সকল অবস্থা বিচার করা যায়না বরং কখনও তার বিপরীতও চলে। এর মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসলিমদের বিরূদ্ধে প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধ এক সময় পূর্ণাঙ্গ রূপে বিপরিত রূপ ধারণ করতে পারে। অনুরূপ ভাবে যুলকারনাইন এর ঘটনা উপলব্ধি করায় যে, যমীন আল্লাহর জন্য। তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে চান উত্তরাধিকারী করেন তবে সৎ ব্যক্তিগণ ঐ ব্যাপারে বেশী হকদার। অত:পর নাযিল হয় সূরায়ে যুমার। যা ঈঙ্গিত করে হিজরতের দিকে। এবং একথা স্পষ্ট করে দেয় যে, আল্লাহর যমীন সঙ্কীর্ন নয়। আল্লাহ বলেন,

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

অর্থঃ "যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী তাদেরকে অগণিত পুরস্কার দেয়া ।" (যুমারঃ ১০) এরই প্রেক্ষিতে নবী (সাঃ) দয়া পরবশ হয়ে তাঁর সাথীদেরকে মুশরিকদের যাতনা হতে মুক্তিদান কল্পে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। আর আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজাশী একজন ন্যায় পরায়ণ ও দয়ালু বাদশাহ ছিলেন।

নবুয়াতের ৫ম সনের রজব মাসে মুসলমানদের প্রথম দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। তারা ছিল ১২জন পুরূষ ও ৪জন মহিলা। তাদের দলনেতা ছিলেন হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ)। তাঁর সাথে ছিলেন নবী নন্দিণী হযরত রূকাইয়্যা (রাঃ)। নবী (সা:) তাদের উভয়ের সম্পর্কেই বলেছিলেন, তারাই নবীর পরিবারের প্রথম দল যারা

ইব্রাহীম ও লুৎ (আঃ) এর পর আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে ছিল। তাদের সফর ছিল সাগর পথে রাতের অন্ধকারে এবং অতি সঙ্গোপনে। তারা আবিসিনিয়ায় পৌঁছে উত্তমভাবে অবস্থান করতে শুরূ করেন। আর ঐ বছর একদা নবী (সাঃ) রমাযান মাসে হারাম শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে তখন মুশরিকদের বৃহৎ একটি দল ছিল। হঠাৎ তিনি তাদের সম্মুখে সূরাতুন নাজম পাঠ করলেন। তারা কিন্তু ইতি পূর্বে আল্লাহর কথা কখনো শুনতে চায়নি। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾

অর্থঃ "আর তারা বলে, এই কুরআনের দিকে তোমরা কর্ণপাত করোনা বরং ওতে হট্টগোল কর যাতে করে তোমরা বিজয়ী হতে পার।" (সূরা ফুস্‌সেলাতঃ ২৬) কিন্তু যখন তারা হঠাৎ নবীর (সাঃ) কণ্ঠ শুনতে পেল তখন তারা তা ভালভাবে শুনতে আরম্ভ করল। একনকি যখন তিনি তাদের নিকট এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾

অর্থঃ "তোমরা আল্লাহর জন্য সিজদা কর ও ইবাদত কর।" (নাজম: ৬২)। আত:পর তিনি (সা:) সিজদা করলেন । তখন তারাও যমীনে মাথা নত করে সিজদায় পড়ে গেল। এতে করে তাদেরকে নিন্দা ও ভৎর্সনা করে ঐ সমস্ত মুশরিকগণ যারা এই দৃশ্য প্রতক্ষ্য করেনি। তখন তারা রাসূলের (সা:) উপর মিথ্যা আরোপ করত: বলতে লাগে তিনি তাদের মুর্তীর প্রশংসা করেছিলেন আর বলে ছিলেন একথাগুলি:

(تلك الغرانقة العلى وأن شفاعتهم لترتجى) "ঐ সমস্ত যুবতী প্রতিমা গুলো হক এবং তাদের শাফায়াত অবশ্যই (সকলের) কাম্য"। এদিকে আবিসিনিয়ায় মুহাজিরদের নিকট এই মর্মে খবর পৌছে যায় যে, কুরাইশগণ ইসলাম কবূল করেছে। সুতরাং তারা ঐ বছরের শাওয়াল মাসে প্রত্যাগমণ করে। যখন তারা মক্কায় এসে পৌঁছে তখনই তারা আসল তথ্য অবগত হয়। তখন তাদের কেউ কেউ পুনরায় আবিসিনিয়া ফেরত চলে যায় এবং কেউ কেউ আত্ম গোপন করে অথবা কুরাইশদের কারো নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরতঃ

মুসলিমদের উপর নির্যাতন অব্যাহত থাকলে নবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে আবার আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু কুরাইশগণ সে ব্যপারে সজাগ ছিল। তারা উহা বাঞ্চাল করার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ব্যার্থতায় পর্যবশিত হয়। মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল তিরাশি জন পুরূষ ও আঠারো জন মহিলা। ইহা মুশরিকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। সুতরাং তারা দুজনকে (আবিসিনিয়ায়) প্রেরণ করল। তাদের নাম হল: আমর ইবনুল আস ও আব্দুল্লাহ বিন রবিআ'। তাঁরা দু'জন তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তাদের সাথে অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করা হয়। তারা তা নাজাশী ও তার সভাসদদের দরবারে পেশ করে এবং মুসলমানদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে দেয়ার দাবী উত্থাপন করে। তারা অভিযোগ পেশ করে যে, এরা নতূন ধর্ম নিয়ে আগমণ করেছে এবং সে কারণে নিজের আত্মীয় স্বজন থেকে পৃথক হয়েছে।

এতদা শ্রবণে নাজাশী মুসলিমদের নিকটে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে আহবান করেন এবং তাদের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন জাফর বিন আবু তালেব কথা বললেন এবং জাহেলীয়াতে থাকাবস্থায় তারা যেমন্ত মুর্তি পূজা, অশ্লীল কাজ-কর্ম এবং যুলম নির্যাতনসহ অন্যান্য পাপ কর্মে লিপ্ত ছিলেন, তা ব্যক্ত করলেন। তিনি আরো বর্ণনা দেন যে, ইসলাম এসে তাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা দিয়েছে, এবং অশ্লীল কাজ বর্জনের নির্দেশ দিয়েছে। তাদেরকে উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু তাদের জাতি তাতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তাই তারা স্বগোত্রের যুল্‌ম হতে রক্ষা পেতে এবং ন্যায় পরায়ন বাদশা নাজাশীর সান্নিধ্যে থাকতে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছে।

বাদশাহ্ নাজাশী বললেন, আমাকে কুরআন পাঠ করে শোনাও। হযরত জা'ফর (রাঃ) তার নিকটে সূরা মারইয়াম এর প্রথম দিক থেকে পড়ে শুনালেন। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন, এমনকি তার দাড়ি গুলো চোখের পানিতে ভিজে গেল। তার সভাসদগণও কাঁদলো। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয় ইহা এবং ঈসা (আঃ) যা নিয়ে এসেছিলেন তা

একই প্রদ্বীপ হতে নির্গত। তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং মুশরিকদের নিকটে তাদের উপঢৌকন সমূহ ফেরৎ দিয়ে তাদেরকে অকৃতকার্য করে ফিরিয়ে দিলেন।

এক্ষেত্রে মুহাজিরদের ভূমিকা অত্যন্ত সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে। তাঁরা পরিস্কারভাবে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলমানদের বিশ্বাস তুলে ধরলেন। যা ছিল তথাকার খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাদের কাছে ফেরত পাঠানের ভয়ে নাজাশী বা তার সভাসদদের বিন্দুমাত্র তোষামোদ করলেন না। আল্লাহ তাদের পরিণাম ভাল করলেন এবং তথায় নির্ভয়ে বসবাসের সুযোগ করে দিলেন।

কুরাইশদের পক্ষ হতে আবু তালেবকে হুমকী প্রদানঃ

মুশরেকগণ মুসলমানদেরকে স্বীয় দেশে ফিরাতে ব্যর্থ হলে নতূন কৌশল সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা শুরূ করে। তাদের ধারনা রাসূল (সাঃ)কে তার দাওয়াত হতে বিরত রাখার মাধ্যমেই একমাত্র এই দাওয়াতী কাজ বন্ধ করা সম্ভব। এজন্য তারা আবু তালেবকে মৃত্যুদম পর্যন্ত যুদ্ধ করার ধমকি দেয়। বিষয়টি আবু তালেবের নিকটে কঠিন মনে হয়। ফলে তিনি রাসূল (সাঃ)কে ডেকে সে সম্পর্কে অবগত করান। এবং তাঁর নিকটে এই মর্মে আবেদন পেশ করেন যে, তিনি যেন তার সামর্থের বাইরে উপর তার কোন বোঝা না চাপান। নবী (সাঃ) এতে বুঝে নিলেন যে, আবু তালেব তাকে আর সহযোগিতা করবেন না। তাই তিনি বললেন, হে আমার চাচা! আল্লাহর শপথ তারা যদি সূর্যকে আমার ডান হাতে এবং চন্দ্রকে বাম হাতে এনে দেয় এই শর্তে যে, আমি এই ধর্ম ছেড়ে দিব - তবু আমি তা ছাড়বো না। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন চাচা (আবু তালেব) তাকে ডেকে বললেন, ঠিক আছে তুমি যাও, আর যা পছন্দ হয় তা-ই বল। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি "তোমাকে আমি কোন প্রত্যাখ্যান করবনা।"

আবূ তালিবের নিকট দ্বিতীয় বার প্রতিনিধি প্রেরণ ঃ

কুরাইশ সম্প্রদায় যখন দেখল যে, রাসূল (সাঃ) তার কর্তব্য চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আবু তালিবও তাঁকে বাধা দেয়নি তখন তারা উমারা বিন ওয়ালীদ বিন মুগীরাহকে সঙ্গে নিয়ে আবু তালেবের কাছে গিয়ে বলল, হে আবু তালিব! মুহাম্মাদ (সাঃ) এর স্থলে এই ছেলেটিকে গ্রহণ করুন। কারণ এছেলে সব চেয়ে নওজোয়ান ও কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সুশ্রী যুবক। এর বিনিময়ে মুহাম্মাদ(সাঃ)কে আমাদের নিকট দিয়ে দিন যাতে করে আমরা তাকে হত্যা করতে পারি। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, কতই না জঘন্য এই মন্তব্যটি! তোমাদের ছেলে আমাকে দিবে যাতে করে আমি তোমাদের স্বার্থে তার লালন পালন করি আর তোমাদেরকে আমার ছেলে দিয়ে দিব যাতে করে তোমরা তাকে হত্যা কর? আল্লাহর শপথ এরূপ কখনই হতে পারেনা। এ দুই ঘটণা নবুওয়াতের প্রায় ৬ষ্ঠ সনের মধ্য ভাগে ঘটেছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে নিধন কল্পে সীমালংঘণকারী কাফেরদের চিন্তা ভাবনাঃ

অবু তালিবের সাথে উক্ত ঘটনার পর মুসলমানদের উপর মুশরিকদের নির্যাতন আরো কঠিণতর হয়ে উঠে। এরই নমূনা স্বরূপ নিম্নের ঘটণাটি উল্লেখ যোগ্যঃ উতাইবাহ্ বিন আবু লাহাব রাসূল (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, "নক্ষত্রের কসম যখন উহা অস্তমিত হয়" এবং "অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল" অত্র দুই বিষয়ের সাথে আমি কুফরী করছি (অর্থাৎ সূরা নজমকে তথা কুরআনকে অস্বীকার করছি)। একথা বলে সে তাঁর (সাঃ) উপর চড়াও হয়ে তাঁর জামা ছিড়ে ফেলে এবং তাঁর চেহারা মুবারকে থুথু ফেলে। নবী (সাঃ) তখন আল্লাহর দরবারে এই মর্মে দু'আ করলেন যেন আল্লাহ তার উপর দনিয়ার কোন একটি কুকুর লেলিয়ে দেন। আল্লাহ্ তাঁর দুআ কবুল করে ছিলেন। একবার উতাইবাহ্ ভ্রমনে বের হল। তারা সিরিয়ার কোন একটি স্থানে এসে তাবু টানালো। রাতের বেলায় একটি বাঘ এসে তাবুর চার পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল। উতাইবা বাঘটি দেখে বলল, আল্লাহর কসম! এই বাঘটি আমাকে খেয়ে ফেলবে। কারণ মক্কায় থাকাবস্থায় মুহাম্মাদ (সাঃ) আমার উপর বদ্ দুআ করেছে। রাত্রে ঘুমানোর

সময় উতাইবার সাথীরা উতাইবাকে তাদের মাঝখানে রেখে নিদ্রা গেল। রাতের অন্ধকারে সেই বাঘটি এসে সবার মাঝখান থেকে উতাইবাকেই উঠিয়ে নিয়ে গেল এবং তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।

নবী (সাঃ)এর সিজদাবস্থায় তাঁর গর্দানে উকবাহ্ বিন মুআইত্ব পা দিয়ে চাপ দিয়েছিল। এতে তাঁর (সাঃ) চক্ষু দুটি বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আবু জাহেল নবী (সাঃ)কে তাঁর সিজদাবস্থায় বড় পাথর দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে যখন তার নিকটবর্তী হল তখন সে পরাজিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে গেল। সাথীরা তাকে বলল, হে আবুল হিকাম! আপনার কি হয়েছে? তখন সে বলল, যখন আমি তাঁর নিকটার্তী হলাম তখন অভূতপূর্ব দৃশ্যের একটি উট আমার সম্মুখীন হল যেন আমাকে হত্যা করার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি পলিয়ে এলাম। নবী (সাঃ) উটের ব্যাখ্যায় বলেন, "উহা ছিল জিবরীল (আ:)। যদি সে নিকটবর্তী হত তাহলে তাকে সে অবশ্যই পাকড়াও করত।"

বুখারীর বর্ণনায় আছে, তিনি উরওয়া বিন যুবায়ের হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমর ইব্নুল আস এর পুত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমায় মুশরিকদের পক্ষ থেকে এর প্রতি সর্বাধিক কঠোর ব্যবহারের সংবাদ দিন। তিনি বললেন, একদা নবী (সাঃ) কা'বার হিজরে অর্থাৎ হিজরে ইসমাঈলে ছালাত আদায় করছিলেন এমতাবস্থায় উকবাহ বিন আবু মুআইত এসে নবী (সাঃ) এর গর্দান মুবারকে কাপড় জড়িয়ে তা অত্যন্ত্য শক্ত ভাবে চেপে ধরে। তখন আবু বাকর (রা:) এসে দুই কাঁধ ধরে তাকে নবীর (সা:) নিকট হতে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি একজন মানুষকে হত্যা করবে শুধু এই কারণে যে সে বলে "আমার প্রতিপালক আল্লাহ্"।[১]

হামযাহ্ (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণঃ

সীমালংঘণ ও যুলুম নির্যাতনে পরিপূর্ণ পরিবেশে মাজলুমদের জন্য একখন্ড আলো বর্তিকা উদ্ভাসিত হল। আর তা হল হযরত হামযাহ (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ। ইহা ছিল নবুওতের ৬ষ্ঠ সনের শেষের দিকের কথা। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হল নিম্নরূপঃ

একদা আবু জাহেল সাফা পর্বতের নিকটে নবী (সাঃ) এর পাশ দিয়ে আতিক্রম করছিল। সে সময় সে তাঁকে গালি দেয় এবং নিন্দা জ্ঞাপন করে। এমনকি শেষে পাথর দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত হানে। এতে করে নবীজীর মাথা হতে রক্ত ঝরতে থাকে। অত:পর সে কা'বার সন্নিকটস্থ সভা কক্ষে যেয়ে কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়। রাসূল (সাঃ)কোন প্রকার প্রতি উত্তর করেননি। হামযাহ্ (রাঃ) তীর কাঁধে শিকার হতে ফিরে এলেন। অতঃপর উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলেন এতে তিনি প্রচন্ডভাবে ক্রুদ্ধ হন। এবং আবু জাহেলের উদ্দেশ্যে তার সভাকক্ষ পানে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে তাকে বলেন, তুমি কি আমার ভাতিজাকে গাল-মন্দ করছ, অথচ আমি স্বয়ং তার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত? অতঃপর তিনি তাকে প্রহার করেন এবং তার মাথা ফাটিয়ে দেন। তার ইসলাম গ্রহণ প্রথম দিকে নিজ আত্মীয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে ছিল। এর পরই আল্লাহ তার বক্ষকে প্রসারিত করে দেন ফলে তিনি সূদৃঢ় রশী তথা ইসলামকে ভাল ভাবে ধারণ করে নেন।

উমার বিন খাত্তাবের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণঃ

হামযাহ্ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পর হযরত উমার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলামে দীক্ষা লাভ ছিল নবুওয়াত ৬ষ্ঠ সনের যুলহাজ্ব মাসে। রাসূল (সাঃ) তার ইসলাম কবূলের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছিলেন। নবী (সাঃ) বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্! উমার বিন খাত্তাব ও আবু জাহ্ল বিন হেশাম এর মধ্য হতে আপনার নিকট যে অধিক প্রিয় তাকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করুন। আল্লাহর কাছে উমার (রাঃ) অধিক প্রিয় ছিলেন।" [২]

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদঃ নবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের উপর মক্কার মুশরিকদের নির্যাতনের বর্ণনা, হাদীছ নং- ৩৫৬৮।

[2] - (সহীহ) তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদঃ উমার (রাঃ)এর ফজীলত। হাদীছ নং- ৩৬১৪। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন।

উমার (রাঃ) অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির লোক ছিলেন। মুশরিক থাকাবস্থায় তিনি মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতেন এবং তাদের উপর কঠোর ছিলেন।

উমার (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এইযে, উমার (রাঃ)এর বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব এবং তার স্বামী সাঈদ বিন যায়েদ গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। খাব্বাব (রা) ফাতেমাকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

একদিন উমার (রাঃ) রাসূল (সাঃ)এবং সাহাবীদের উপর আক্রমণ করার জন্য তরবারি নিয়ে বের হলেন। এসময় নবী (সাঃ) ৪০জনের মত লোক নিয়ে সাফা পাহাড়ের নিকটে একটি বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে হামজাহ, আবু বকর এবং আলী (রাঃ)ও ছিলেন। রাস্তায় নুআইম ইবনে আব্দুল্লাহ এর সাথে দেখা হল। নুআইম ইবনে আব্দুল্লাহও তার গোত্রের লোকদের অত্যাচারের ভয়ে ইসলাম গোপন রেখেছিল। তিনি উমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছেন? উমার বললেন, শুনেছি মুহাম্মাদ বেদীন হয়ে গেছে, সে আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, এবং আমাদের মা'বূদদেরকে গালি দিচ্ছে এবং আমাদের জ্ঞানীদেরকে বোকা বলছে ও আমাদের দ্বীনকে দোষারূপ করছে। তাই তাকে হত্যা করতে যাচ্ছি।

নুআইম বললেন, তোমার কি মনে হয় মুহাম্মাদকে হত্যা করলে তার গোত্রের লোকেরা তোমাকে ছেড়ে দিবে? তাছাড়া মুহাম্মাদকে হত্যার পূর্বে নিজের ঘর ঠিক করা দরকার। তোমার বোন এবং বগ্নীপতি সাঈদ বিন যায়েদ ইসলাম গ্রহণ করেছে। একথার মাধ্যমে নুআইমের উদ্দেশ্য ছিল উমারকে মুহাম্মাদ (সাঃ)এর দিকে যাত্রা থেকে বিরত রাখা।

উমার মুহাম্মাদকে হত্যার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বোনের বাড়ীর দিকে যাত্রা করল। এসময় খাব্বাব ফাতেমা এবং তার স্বামী সাঈদকে কুরআন মযীদের সূরা ত্বহা পড়াতে ছিলেন। উমারের আগমণ অনুভব করে খাব্বাব ঘরের এক পাশে লুকিয়ে গেলেন এবং ফাতেমাও কুরআনের কপিটি লুকিয়ে ফেলেলন। অথচ উমার এর আগেই খাব্বাবের কণ্ঠস্বর শুনেছিল। উমার ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাস করল, আমি কিসের আওয়াজ শুনতে পেলাম? তারা বলল, তুমি কিছুই শুনতে পাওনি। সে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি শুনেছি, তোমরা উভয়েই নাকি মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে গিয়েছ। এই বলে সাঈদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে প্রহার করা শুরু করল। ফাতেমা ফেরাতে গেলে তার মুখমন্ডলে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করে দিল। পরিশেষে তারা স্বীকার করল যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান এনেছি। তোমার মন যা চায় তাই করতে পার। উমার তার বোনের চেহারায় রক্ত দেখে লজ্জিত হল এবং বলল, তোমরা যে পুস্তিকাটি পাঠ করতেছিলে তা আমাকে দাও। আমি দেখতে চাই এতে কি রয়েছে। ফাতেমা বলল, আমাদের ভয় হচ্ছে, তুমি এটিকে অপদস্ত করবে এবং আমাদেরকে তা আর ফেরত দিবেনা। উমার দেব-দেবীর নামে শপথ করে বলল, সে অবশ্যই তা ফেরত দিবে। ফাতেমা বলল, তুমি অপবিত্র। পবিত্র লোক ব্যতীত অন্য কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারেনা। উমার উঠে গোসল করে আসল। ফাতেমা তার হাতে কুরআন মযীদ দেয়ার পর সে সূরা ত্বহা পাঠ করল। সূরা ত্বহার প্রথমাংশ পাঠ করেই সে বলল, কত সুন্দর এই কালাম। এশুনে খাব্বাব বের হয়ে এসে বলল, আপনার ব্যাপারে আল্লাহর নবীর দু'আ কবূল হয়ে গেছে। কেননা আমি নবী (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! উমার ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জাহেল ইবনে হিশাম-এদু'জনের একজনের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী কর। হে উমার! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। হে উমার! তুমি আল্লাহকে ভয় কর।

উমার (রাঃ) তখন বললেন, হে খাব্বাব! মুহাম্মাদ কোথায় আছে, আমাকে দেখিয়ে দাও। আমি তাঁর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করব। খাব্বাব বললেন, তিনি একদল সাহাবীসহ সাফা পাহাড়ের নিকস্থ কোন বাড়ীতে অবস্থান করছেন।

উমার তরবারি হাতে নিয়ে সেদিকে চললেন। দরজায় গিয়ে করাঘাত করার সাথে সাথে একজন দাড়িয়ে দরজার ফাঁকা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে দেখলেন, উমার উম্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে উপস্থিত। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূল (সাঃ)কে সংবাদ দিলেন।

হামজাহ (রাঃ) বললেন, তাকে আসতে বল। সে যদি ভাল নিয়তে এসে থাকে, তাহলে তার সাথে আমরা ভাল ব্যবহার করব। আর যদি মন্দ নিয়তে এসে থাকে তবে আমরা তার তলোওয়ার দিয়েই তাকে হত্যা করব। রাসূল

(সাঃ) বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও। সে ভিতরে প্রবেশ করলে রাসূল (সাঃ) তার চাদরে ধরে শক্ত করে টান দিলেন এবং বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র উমার! কি কারণে তুমি এখানে এসেছ? আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয় তোমার উপরে আল্লাহর শাস্তি নাজিল হওয়ার পূর্বে বিরত হবেনা।

একথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এসেছি আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য।

একথা শুনে রাসূল (সাঃ) এমন উঁচু কণ্ঠে তাকবীর পাঠ করলেন, যা শুনে ঘরের সকলেই বুঝতে সক্ষম হল যে, উমার মুসলমান হয়ে গেছে। মুসলমানগণ সেখান থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, উমার (রাঃ) এবং হামজাহ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা শক্তিশালী হয়েছেন। মুসলমানগণ এও উপলব্ধি করলেন যে, এখন থেকে তারা রাসূল (সাঃ) এবং তাদেরকে শত্রুদের হাত থেকে হেফাজত করবেন।

মোট কথা উমার (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হল। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, উমার (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা সম্মানিত ছিলাম।[১]

ইবনে উমার (রাঃ) উমার (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদা উমার (রাঃ) ভীত অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় আস বিন ওয়ায়িল আগমণ করলেন। সে উমার (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? উমার (রাঃ) বললেন, আপনার গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। আস ইবনে ওয়ায়িল বলল, তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। আস বিন ওয়ায়িল বের হয়ে গিয়ে দেখে, মানুষেরা দলে দলে উমার (রাঃ)এর দিকে আগমণ করছে। আস বিন ওয়ায়িল জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা উত্তরে বলল, আমরা উমার ইবনে খাত্তাবকে হত্যা করতে যাচ্ছি। কারণ শুনতে পেলাম, সেখানে বেদ্বীন হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তোমরা কখনই তা বাস্তবায়ন করতে পারবেনা। কারণ আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। একথা শুনে সকলেই ফেরত গেল।[২]

কাবার আঙ্গীনায় উমার (রাঃ) কতৃক গোপনে রাসূল (সাঃ)এর কুরআন শ্রবণের ঘটনা, এবং পূর্বোল্লেখিত উমার (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত নয়। তবে জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থে এসমস্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল (সাঃ)এর নিকট কুরায়শ প্রতিনিধিঃ

এই দুই মহাবীর তথা হামযাহ্ ও উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের মুশরিকগণ তাদের বেহুশী থেকে জাগ্রত হয়। এবং রাসূল (সাঃ)এর সাথে আপোস করার প্রচেষ্টা চালায় যাতে করে তাকে তার দাওয়াত হতে বিরত রাখতে পারে। উৎবাহ তাঁর নিকট আগমণ করে, তখন তিনি একাকী মসজিদে বসা ছিলেন। সে তাঁকে লক্ষ্য করে বলে: যদি তুমি মাল সম্পদ চাও তবে আমরা তোমার জন্য সম্পদ একত্রিত করে মক্কার সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দিব। আর যদি তুমি মান মর্যাদা চাও তবে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বনিয়ে দিব। আর যদি তুমি রাজত্ব চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা (বাদশাহ) নির্বাচন করব। আর তুমি যদি অসুস্থ হয়ে থাক, তোমার আরোগ্যের জন্য সার্বিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। সে কথা শেষ করলে নবী (সাঃ) বললেন, হে আবুল অলীদ! আমার কথা শুন! এই বলে তিনি সূরায়ে ফুস্‌সেলাত পাঠ করলেন, উৎবাহ তা মনোযোগ দিয়ে শুনল। নবী (সাঃ) যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌছালেন,

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾

অর্থঃ "অত:পর যদি তারা মুখফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন: আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত। (ফুস্‌সিলাতঃ ১৩) এতদা শ্রবণে ওলীদ ভিত হয়ে উঠে গিয়ে রাসূল (সাঃ)এর মুখে হাত রেখে বলতে শুরূকরে - আমি তোমাকে আল্লাহ্ এবং আত্মীয়তার দোহাই দিচ্ছি। একথা সে বলেছিল তার উপর শাস্তি পতিত হওয়ার আশঙ্কায়। এর পর সে নিজ গোত্রে কাছে ফিরে গেল। তাকে দেখে তারা

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদঃ উমার (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ, হাদীছ নং- ৩৫৭৪।

[2] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদঃ উমার (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ, হাদীছ নং- ৩৫৭৫।

বলে উঠল, আল্লাহ্‌র শপথ! যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল ঐ চেহারা ভিন্ন অন্য চেহারায় সে ফিরে এসেছে। যখন সে তাদেরকে বলল, আমি এমন এক বাণী শুনেছি যার অনুরূপ আর কখনও শুনিনি। উহা কবিতাও নয়, যাদুও নয়, জ্যোতিষ বিদ্যাও নয়। হে আমার গোত্রের লোক, আমার অনুসরণ কর এবং তাকে (মুহাম্মাদকে) কোন প্রকার বাধা প্রদান করিও না। আল্লাহ্‌র শপথ! যে কথা আমি শুনেছি নিঃসন্দেহে উহা একটি মহান সংবাদ হবে। আরব বাসী যদি তাকে হত্যা করে ফেলে তবে তো তোমরা যা চাও তাই বাস্তবায়িত হল। আর যদি উনি তাদেরও উপর বিজয়ী হন তবে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব। আর তোমরা হবে সব চাইতে সৌভাগ্যশালী । একথা শুনে তারা বলল, হে আবু ওয়ালীদ! আপনাকে সে যাদু করেছে। তখন সে বলল: তার ব্যাপারে আমারও তাই মনে হয়। তোমাদের মন যা চায়, তাই কর।

হাশেম ও আব্দুল মুত্তালেব গোত্রের সামনে আবু তালেবঃ

রাসূল (সাঃ)ক গোপনে কয়েকবার হত্যা করার প্রচেষ্টা চালানোর পর আবু তালিব তার ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছে গেল। তাদের ঐ ঐক্যমতের দিকেই আল্লাহ্‌ তাআলা ইঙ্গিত করে বলেন,

﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُون ﴾

অর্থঃ "নাকি তারা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে, তাহলে আমিও চুড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী।" (যুখরূফঃ৭৯) তখন আবু তালিব তার পরিবারের বনী হাশিম, বনী আব্দুল মুত্তালিব এবং আবদে মানাফের কাছে গিয়ে তাদেরকে আহবান করেন স্বীয় ভাতিজার হেফাযত ও তার পক্ষাবলম্বনের জন্য। তারা মুসলিম কাফের নির্বিশেষে সকলেই তার ডাকে সাড়া দেয়। অবশ্য উহা ছিল গোষ্ঠীগত টানের কারণে। তবে তার ভাই আবু লাহাব ছিল ব্যতিক্রম ধর্মী। সে কোরাইশদের সাথেই ছিল।

নবী (সাঃ) এবং বনী হাশেমকে সাধারণ বয়কটঃ

হামজাহ এবং উমার (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ, নবী (সাঃ) কতৃক সমঝোতা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং রাসূল (সাঃ)কে হেফাজতের জন্য বনী আবদুল মুত্তালিব ও বনী হাশিম গোত্রের ঐক্য বদ্ধ হওয়াতে মুশরেকরা বিচলিত হয়ে গেল। তারা নবী (সাঃ) এবং বনী হাশেমকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা সকলেই একমত হল যে, নবী (সাঃ)কে হত্যার জন্য তাদের হাতে সোপর্দ না করা পর্যন্ত নিম্নে লিখিত বিষয়ে অবরোধ বলবৎ থাকবে।

১) বনী হাশেম ও আব্দুল মোত্তালেব গোত্রের সাথে সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ থাকবে।
২) তাদের সাথে বিবাহ-শাদী বন্ধ থাকবে।
৩) তাদের সাথে উঠাবসা ও চলা-ফেরা বন্ধ থাকবে।
৪) এমন কি তাদের সাথে কোন প্রকার কথা-বার্তাও বলবেনা।

তারা বনী কেননা গোত্রের আঙ্গিনায় একত্রি হয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলোতে একমত হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন, কুরবানীর দিনের পূর্বে মীনাতে অবস্থানকালে বলেন যে, আগামীকাল আমরা কেননা গোত্রের আঙ্গিনায় অবতরণ করব। সেখানে তারা কুফরীর উপর একত্রিত হয়েছিল। কুরাইশ এবং কেননা গোত্র এই মর্মে একমত হল যে, নবী (সাঃ)কে তাদের হাতে হস্তান্তর করার পূর্ব পর্যন্ত তারা হাশেম এবং আব্দুল মোত্তালেব গোত্রের কাছে বিয়ে দিবেনা এবং তাদের সাথে বেচা-কেনা করবেনা।[১] চুক্তি পত্রটি লিখে তারা কাবা ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখে। কথিত আছে ঐ সহীফা চুক্তিটি বাগীয বিন আমের বিন হাশেম লিখে ছিল। তাই নবী (সাঃ) তার উপর বদ দু'আ করেছিলেন যার ফলে তার একটি হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল।

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মক্কায় অবতরণ প্রসঙ্গে। হাদীছ নং- ১৪৮৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মুহাস্সাব উপত্যকায় অবতরণ এবং তথায় নামায আদায় সম্পর্কে। হাদীছ নং- ২৩১৬।

এই চুক্তিপত্র লিখার পর বনী হাশেম এবং বনী মোত্তালে শিআবে আবূ তালেব তথা দুই পাহাড়ের মধ্যবতী একটি স্থানে আশ্রয় নিল। এটি ছিল ৭ম হিজরীর মুহাররাম মাসের প্রথম দিকের ঘটনা। চুক্তি মোতাবেক তাদের কাছে খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করা বন্ধ করে দেয়া হল। প্রচন্ড খাদ্যাভাবে এবং ক্ষুধার তাড়নায় তারা এক পর্যায়ে গাছের পাতা এবং জীব-জানুওয়ারের চামড়া খেতে বাধ্য হলেন। ক্ষুধার যন্ত্রনায় প্রায়ই শিশু ও মহিলার ক্রন্দন শুনা যেত। মক্কায় পণ্য দ্রব্য আসার সাথে সাথেই মুশরেকেরা চড়া মূল্যে ক্রয় করে নিত। রাতের বেলায় এবং গোপনে মাঝে মাঝে তাদের কাছে সামান্য খাদ্য পৌঁছত। আবূ তালেব রাসূল (সাঃ)এর জীবন নাশেরও ভয় করতেন। রাতের প্রথম প্রহরে আবূ তালেব নবী (সাঃ)কে বিছানায় শয়নের নির্দেশ দিতেন। মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়লে নবী (সাঃ)এর বিছানা পরিবর্তন করে আবূ তালেব তদস্থলে নিজের কোন ছেলে বা ভাতিজাকে শুইয়্যে দিতেন।

তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার নবুওয়তের দশম বছরের মুহররাম মাসে এই চুক্তিপত্রটি ছিড়ে ফেলা হয় এবং তার অঙ্গিকারগুলো বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। হিশাম বিন আমর সর্বপ্রথম এব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি রাতের বেলায় গোপনে বনী হাশেমের কাছে খাদ্য নিয়ে যেতেন। তিনি কতিপয় ব্যক্তির কাছে গেলেন এবং বললেন, তোমরা সাচ্ছন্দে পানাহার করছ এবং পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করছ অথচ তোমাদেরই আত্মীয়রা কি অবস্থায় আছে- তা তোমরা ভালভাবেই অবগত আছ। তোমরা কিরূপে এহেন অবস্থা সহ্য করছ? এই বলে তিনি কতিপয় লোককে আপন মতের পক্ষে একত্রিত করলেন। সকাল বেলা কা'বায় গিয়ে চুক্তির বিলুপ্তি ঘোষণা করলেন। আবু জাহেল তাদেরকে বিরত রাখর ব্যর্থ চেষ্টা করল। মুতঈম বিন আদী এটি ছেড়ার জন্য অগ্রসর হয়ে দেখল যে, শুধুমাত্র (بِاسْمِكَ اَللَّهُـــمَّ) ব্যতীত চুক্তির সকল অংশই উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে। তার পরও তিনি চুক্তিপত্রটি ছিড়ে ফেললেন।

এই ব্যাপক বয়কোটের তিন বছর পর, নবুওতের দশম বছরের মুহার্‌রম মাসে উক্ত সহীফাহ খানা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলা হয়। একাজটির দায়িত্ব নিয়েছিলেন হেশাম বিন আমর। তিনি খাদ্য দ্রব্য নিয়ে রাত্রি ভাগে বনু হাশেমদের নিকটে যেতেন। তিনি একদিন কিছু লোকের নিকটে এসে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের সাথে কথা বললেন। তাদেরকে বললেন: তোমরা কি রাজী আছ যে তোমরা পানা-হার করবে অথচ তোমাদের আত্মীয় স্বজন কি অবস্থায় আছে তা তোমরা ভালো করেই জান। তিনি কিছু লোক জমায়েত করেন। লোকেরা তার মতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। অতঃপর সকাল বেলা তারা কাবা ঘরের দিকে অগ্রসর হল এবং বয়কট প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা দিল। আবু জাহেল তাদেরকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হল। অত:পর মুত্‌ইম ওটা ছিড়ে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু গিয়ে দেখতে পেলেন চুক্তিপতটিকে উই পোকা খেয়ে ফেলেছে। মাত্র باسمـــك اللـــهمَّ "হে আল্লাহ তোমার নামে শুরু করছি" এই অংশটুকু ব্যতীত। অত:পর তিনি চুক্তিপত্রটি ছিড়ে ফেললে রাসূল (সা:)ও শে'বে অবস্থান রত তার সকল সঙ্গী সেখান থেক বের হয়ে আসলেন। মক্কা বিজয়ের দিন হিশাম ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে।

এই যুলুম নির্যাতনে নিপতিত হয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরাইশদের উপর বদ দু'আ করলেন। ফলে তাদের মধ্যে ব্যাপক দূর্ভিক্ষ দেখা দিল। আবু সুফিয়ান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে আগমণ করে তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করার আবদার জানাল এবং তাঁর কাছে আত্মীয়তার সম্পর্ক তুলে ধরল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্যে দু'আ করলেন। তাদের উপর থেকে আযাব উঠে গেলে পুনরায় তারা কুফরীতে ফেরত গেল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, কাফেরেরা যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কঠোর নির্যাতন চালালো, তখন ইউসূফ (আঃ)এর আমলের দূর্ভিক্ষের ন্যায় কুরাইশদের উপর দূর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেয়ার জন্যে বদ দু'আ করলেন। ফলে তাদের উপর অভাব ও অনাবৃষ্টি নেমে আসল। ক্ষুধার জ্বালা সয্য করতে না পেরে তারা মৃত জন্তুর গোশত খেতে বাধ্য হল। তারা যখন আকাশের দিকে তাকাতো তখন ক্ষুধার তাড়নায় শুধু ধোঁয়া দেখতে পেতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (١٠) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٢) أَنَّـــى لَهُـــمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (١٤) إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (١٥)﴾

অর্থঃ অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে। এবং তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে মানব জাতিকে। এটা হবে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। তখন তারা বলবে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন আমরা ঈমান আনয়ন করব। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের কাছে তো এসেছে সুস্পষ্ট একজন রাসূল। অতঃপর তারা তাঁকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বলেছে, সেতো শেখানে কথা বলছে, সে তো একজন পাগল। (সূলা দুখানঃ ১০-১৫) ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে কুরাইশদের একজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কুরাইশদের জন্যে বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। কারণ তারা হালাক হয়ে যাচ্ছে। কুরাইশী লোকটিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, নিশ্চয়ই তুমি একজন সাহসী ব্যক্তি। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। বৃষ্টি অবতীর্ণ হল। তারা যখন সুখ-শান্তি ফেরত পেল, তখন তারা আগের অবস্থায় ফেরত গেল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন,

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾

অর্থঃ "যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই। (সূরা দুখানঃ ১৬) ইবনে মাসউদ বলেন, বদরের যুদ্ধে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে।[১]

নবী (সাঃ)এর কাছে কুরাইশদের মু'জেযা তলবঃ

মুসলমানদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার বাড়তে থাকল। এমনকি তারা তাঁকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। তারা নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ কিছু নিদর্শনও আনয়ন করতে বলল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কুরাইশরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলল, আমাদের জন্যে তোমার প্রভুর কাছে দু'আ কর। তিনি যেন আমাদের জন্যে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন। তাহলেই আমার তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করব। তিনি তাদেরকে বললেন, আসলেই কি তোমরা ঈমান আনবে? তারা বলল, অবশ্যই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করলেন। জিবরীল ফেরেশতা এসে বললেন, হে নবী! আপনার প্রভু আপনাকে সালাম দিয়েছেন। আপনি যদি চাইলে সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হবে। কিন্তু তার পরে যে কুফরী করবে আমি তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব। আর আপনি চাইলে তাদের তাওবার দরজা খোলা রাখব। এ খথা শুনে তিনি বললেন, আমি চাই তারা তাওবা করুক।[২]

কিন্তু তার পরও মুশরিকদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে নিদর্শন দেখানোর জন্যে দু'আ করলেন। আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, মক্কাবাসীরা নিদর্শন দেখতে চাইলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন। এমনকি চন্দ্রের দুই খন্ডের মধ্য দিয়ে তারা হেরা পাহাড় দেখতে পেল।[৩]

মুশরিকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কুরাইশরা ইহুদীদেরকে বলল, আমাদেরকে এমন কিছু বিষয় দাও যা আমরা এই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করব। ইহুদীরা বলল, তাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। ইবনে আব্বাস বলেন, তারা ইহুদীদের পরামর্শ অনুযায়ী রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ নিম্মের আয়াতটি নাযিল করলেন।

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

অর্থঃ তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন যে, রূহ আমার প্রভুর আদেশ মাত্র। তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৮৫)

দুঃখের বছর ঃ (عـــام الـــحـــزن)

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাফসীর, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণী, يغشى الناس এর তাফসীর। হাদীছ নং- ৪৪৪৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সিফাতুল জান্নাতি ওয়ান্ নার। হাদীছ নং- ৫০০৬।

[2]- মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং- ২০৫৮। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন।

[3] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদঃ চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করণ, হাদীছ নং- ৩৫৭৯।

আব তালেবের অসুখ স্থায়ী রূপ ধারণ করল। এবং শে'বে অবরুদ্ধাবস্থা থেকে বের হওয়ার ছয় মাস পর তথা নব ওতের দশম সনের রজব মাসে তিনি এন্ে কাল করলেন। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে রস ল (সা:) তার কাছে এলেন এ সময় সেখানে আব জাহেল (উপস্থিত ছিল)। তিনি (সা:) বললেন ঃ হে আমার চাচা! আপনি বলুন (لاإلــه إلاالله) "আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই"। এই কলেমাটি আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে দলীল স্বরূপ পেশ করব। তখন আব জাহেল বলল: (হে আব তালেব!) আপনিকি (আপনার পিতা) আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে বিমুখ হচেছন? এ ভাবে সে তার সাথে কথা বলতে থাকল। শেষ পর্যন্ আব তালিব বললেন - আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই রয়ে গেলাম। (এর পরই তিনি মৃত্যু বরণ করেন) নবী (সা:) বললেন: নিশ্চয় আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব যতক্ষণ পর্যন্ সে ব্যাপারে আমাকে বাধা না দেওয়া হবে। এরই প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হয়:

"কোন নবী এবং ঈমানদারদের জন্য সমিচীন নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যদিও তারা নিকটাৱীয়ও হয় না কেন। এই কথা তাদের নিকট স্পস্ট হয়ে যাবার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।" (তাওবা-১১৩)।

আরো অবতীর্ণ হয এই আয়াতঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

"নিশ্চয় আপনি যাকে ভালবাসেন তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না।" (কাসাস - ৫৬)। এ কথা কারো কাছে গোপন নেই যে, মৃত্যুদম পর্যন্ ইসলামী দাওয়াত ও মুসলিমদের সংরক্ষণ করনে আব তালিবের কিরূপ ভূমিকা ছিল ।

ছহীহ বুখারীতে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের বর্ণনায় এসেছে। তিনি নবী (সা:)কে বলেছিলেন ঃ আপনি কি আপনার চাচার কোন উপকার সাধন করতে পারবেন (পরকালে)? কারণ তিনি তো আপনাকে চতুর্দিক থেকে সংরক্ষণ করতেন এবং আপনার খাতিরে রাগান্বিত হতেন। তদুত্তরে তিনি বলেন: তিনি পায়ের পাতা পরিমান জাহান্নামের আগুনে থাকবেন। যদি আমি না হতাম তবে তাঁর ঠিকানা হত জাহান্নামের সর্ব নিম্ন্ রে ।

আব তালিবের মৃত্যুর দুই কিংবা তিন মাস পর নবী (সা:) এর স্ী হযরত খাদিজা (রা:) মৃত্যু বরণ করেন। সে সময় ছিল নব ওতের দশম সনের রমাযান মাস। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। আর রস ল (সা:) এর ৫০ বছর।

তাঁর মহত্ব বর্ণনায় নবী (সা:) এর এই কথাটি-ই যথেষ্ট- "তিনি আমার উপর ঈমান এনেছেন যখন মানুষ আমার সাথে কুফরী করেছে। এবং আমাকে সত্যবাদী ভেবেছেন যে সময় মানুষ আমাকে মিথ্যায় পরিণত করেছে। এবং তিনি আমাকে তার মালের শরীক বানিয়েছেন যখন মানুষ আমাকে বঞ্চিত করেছে। আর আল্লাহ্ আমাকে তার পক্ষথেকে সন্ ান দান করেছেন যখন তিনি ব্যতীত অন্য স্ী থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন।" (মুসনাদ আহমাদ, ঈষৎ দ র্বল সনদে)।

উভয় দ র্ঘটনা পরপর সংঘটিত হওয়ায় রস লুল্লাহ্ (সা:) চিন্ি ত হয়ে পড়েন। উপরন্ কুরাইশগণ তাকে গাল মন্দ করে এবং কষ্ট দেয়। এমনকি তাদের (কাফেরদের) একজন তাঁর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। তিনি (সা:) বাড়ীতে প্রবেশ করলে তার কোন এক মেয়ে মাথা হতে ধুলা ঝেড়ে দেন এবং এপরিস্থিতি দেখে কাঁদতে শুরূ করেন। নবী (সা:) তাকে বলেন: হে আমার স্নেহের মেয়ে! কেঁদনা, নিশ্চয় আল্লাহই তোমার আব্বাকে রক্ষাকারী। তিনি (সা:) বলেন: আব তালিব এর মৃত্যুর প র্বে কোরাইশগণ আমার সাথে কোনরূপ দ র্ব্যবহার করতে স্বক্ষম হয়নি।

তারা তাঁকে বেশী বেশী শাস্তি দিতে লাগলে তিনি (সা:) তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান। তাই বেরিয়ে পড়েন তায়েফের দিকে এই আশায় যে, তারা হয়তোবা তাঁর দাওয়াত কবুল করবে অথবা তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু সেখানেও কেউ তাঁকে সাহায্য করল না। বরং তারা তাঁকে চরম ভাবে নির্যাতন করল।

এদিকে তাঁর সাথীদের প্রতিও নির্যাতন কঠিন রূপ ধারন করে। এমন কি আবু বাকর(রাঃ) মক্কা ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতের উদ্দেশ্যে "বারকুল গেমাদ" নামক স্থানে পৌছলেন। তখন 'ইবনুদ্ দেগেন্নাহ' নামক জনৈক কুরাইশ সরদার আপন নিরাপত্তায় তাঁকে ফিরিয়ে আনেন ।

এই সমস্ত দু:খ বেদনা এই বছরে পরস্পর সংঘটিত হওয়াই ঐ বছরটিকে রাসূল লুল্লাহ্ (সাঃ) চিন্তার বছর নামে তিনি অভিহিত করেন।

সাওদাহ্ (রা:) সাথে রাসূল লুল্লাহ্র (সা:) বিবাহ ঃ

নব য়তের ১০ম সনের শাওয়াল মাসে নবী(সা:) সাথে সাওদা বিনতে যামআহ্ (রা:) এর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় বার হিজরত কারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতমা । তার প র্বের স্বামীর নাম ছিল সোকরান বিন উমর। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তার সাথেই (আবিসিনিয়ায়) হিজরত করেছিলেন। যখন তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং সাওদাহ্ (রা:) ইদ্দত হতে মুক্ত হন তখন রসূল (সা:) তাকে বিয়ে করেন। তিনিই হলেন খাদীজা (রা:) পর তার প্রথম স্ত্রী। কয়েক বছর অতি বাহিত হওয়ার পর তিনি তার (রাসূলের সাথে রাত্রী যাপনের) পালা আয়েশা (রা:)কে দান করে দেন।

ধৈর্য ও দৃঢ় পদ থাকার কারন সমূহ:

মুসলিমদের প্রতি, বিশেষ করে রসূলের প্রতি যে নির্যাতন হয়েছিল তার আলোচনা করার পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কি ভাবে তাঁরা এ ধরনের লোমহর্ষক নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধারণ করেছিলেন? তার জওয়াব হল: কিছু কারণ রয়েছে যে গুলি মুসলিমদেরকে দৃঢ় পদ থাকার প্রতি সহযোগিতা করেছিল। (আর মূলত: এই কারন গুলিই একজন মুসলিম ও আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দাতাকে প্রতিটি মুহূর্তে দৃঢ় পদ রেখে থাকে)।

কারণ গুলো হল নিম্ন রূপঃ

১) সত্যিকার ঈমান (বিশ্বাস) এবং ভালভাবে আল্লাহর পরিচয় লাভ। কারন ঈমান যখন হৃদয় গভীরে মিলিত হয় তখন সে সুপ্রতিষ্ঠিত পর্বতের ন্যায় অটল হয়ে যায়। সুতরাং সে তখন দুনিয়ার কস্ট-ক্লেশ কিংবা তার নশ্বর সামগ্রীর জন্য মোটেও তওয়াক্কা করে না।

২) উম্মাতে ইসলামীয়ার জন্য রাসূলের (সা:) বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। বস্তুত: তার দিকেই আৱা সমূহ আকৃষ্ট হত। কারন তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্র ও পূর্ণতার আধিকারী । আর এই মহব্বতের প্রতিফলনেই তারা রসূলের গায়ে একটি কাটা বিদ্ধ হোক, আর তারা সুখ সাচ্ছন্দে বসবাস করবে তা তারা পছন্দ করতেন না। এর একটি বাস্তব উদাহরণ হলঃ মুশরিকগণ হযরত আবু বকর (রা:)কে একদিন এমনই প্রহার করেছিল যে, তিনি মৃত্যুবরণ করার উপক্রম হয়ে পড়েছিলেন। তখন কয়েক জন ব্যক্তি তাকে তার বাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে যায় এই বিশ্বাসে যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। যখন তিনি দিনের শেষ ভাগে হুঁশ ফিরে পেলেন, স্বীয় মাতাকে জিজ্ঞেস করলেন মুহাম্মাদের (সা:) কি খবর? তিনি বললেন: আমি জানি না। তিনি আবেদন করলেন, যেন তিনি নবী (সা:) এর খবর তার নিকটে উপস্থিত করেন। তিনি তখন যেয়ে নবীর খবর তথা তিনি আরকামের গৃহে রয়েছেন এই সংবাদ উপস্থিত করলেন। তখন (আবু বাকর রা:) এই মর্মে শপথ করলেন যে, কোন খানা খাবেন না কোন পানীয় পান করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট তিনি না যাবেন। তখন তার মা তাকে তার হাত ধরে নিয়ে গেলেন। এবং রাসূলের (সা:) নিকট প্রবেশ করলেন।

৩) দায়ীত্ব অনুভূতি: ছাহাবায়ে কেরাম তাঁদের কাঁধে অর্পিত দায়িত্বকে ভালো ভাবেই অনুভব করতেন। আর এই দাওয়াত থেকে বিরত থাকার কারণে যে ক্ষতির তাঁরা সম্মুখিন হবেন তার তুলনায় বর্তমানের কষ্ট-ক্লেশ খুবই নগন্য।

৪) শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস এবং এ অনুভূতি, যে তাদেরকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সামনে দন্ডায়মান হতে হবে। এবং স্বীয় কৃত কর্মের ব্যাপারে জবাব দিহী করতে হবে। অত:পর হয় জান্নাতে নতুবা জাহান্নামে যেতে হবে। এ কারনেই তারা তাদের জীবনকে ভীতি ও আশা আকাংখার মধ্য দিয়ে আতিবাহিত করতেন। তারা এই বিশ্বাস করতেন যে, এই নশ্বর দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় আল্লাহর দরবারে মশার ডানার সমপরিমানও নয়।

৫) আল কুরআন ল করীম: উহা অবতীর্ণ হয়েছে- সীমাল ঘন কারীদের বিরূদ্ধে দলীল প্রমানাদী কায়েম করার জন্য। এবং মুসলিমদেরকে দিক নির্দেশনা করত এমন পথের দিতে যাতে রয়েছে তাদের পদ দৃঢ় করণ ও সাহায্য। উহা বিরূদ্ধাচারণ কারী কাফিরদের আনিত অভিযোগেরর জওয়াব দিত।

৬) সফল কাম হওয়ার শুভ সংবাদ সম হ, যা নিয়ে কুরআন করীম অবতীর্ণ হত। সবচেয়ে সংকীর্ন (কঠিন) অবস্থায় আম্বিয়া কেরামদেরও প র্ববর্তীদের ঘটনা, তাদের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল এবং তাওহীদ পন্থীগণ শেষ পরিনতিতে কি লাভ করেছিল ইত্যাদী প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে কুরআন অবতীর্ণ হত। অনুরূপ ভাবে (তাদেরকে দৃঢ় পদ থাকার প্রতি সহযোগিতা করেছিল) ঐ সমস্ শুভ সংবাদ যা তিনি (সা:) পরিবেশন করতেন স্বীয় সাহাবীদের জন্য প্রতিটি স্থানে। তিনি তাদেরকে এই ভাবে এমন সুন্দর প্রশিক্ষণ দিতেন যা তাদের আৱাগুলিকে আসমান মুখী করত {অর্থাৎ আখেরাত মুখী করত} এবং তাদেরকে এই নশ্বর পৃথিবী সম্পর্কে নিরূৎসাহিত করত।

প্রশ্নমালা:

প্রশ্ন/১) সর্ব প্রথম কোন আয়াতটি প্রকাশ্য দাওয়াত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়? উহা অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী (সা:) কি করেছিলেন ।

প্রশ্ন/২) নিম্নের আয়াতগুলোর শানে নুয ল (অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট) বর্ণনা কর:

১ - তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব (تبت يدا أبي لهب)

২ – (انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ...)

৩ - ওয়ায়লুল্লে কুল্লে হুমাযাতিল্লু মাযাহ (ويل لكل همزة لمزة)

৪ – "আওলা-লাকা ফাআউলা সুম্মা আওলা লাকা ফাআওলা"

৫ - (من كفر بالله من بعد إيمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)

"মান কাফারা বিল্লাহে মিম বা'দে ঈমানেহী ইল্লা মান উকরিহ্া...

৬ - স রা - সোওয়াদ

৭ - ইন্নাকা লা-তাহদী মান আহবাবতা (إنك لاتهدي من أحببت)

প্রশ্ন/৩) দাওয়াতী কার্য ক্রমে বাধা প্রদানের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা কর? কুরাইশগণ কি এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে সফলকাম হয়েছিল? তাদের অবলম্বিত নতূন সিদ্ধান্ টি কি ছিল?

প্রশ্ন/৪) রস ল (সা:) এর প্রতি আক্রমণ করা হয়েছিল এই রকম অবস্থান গুলি হতে একটি মাত্র অবস্থানের (ঘটনার) বিবরণ দাও। অনুরূপ ভাবে যে কোন একজন সাহাবীর অনুরূপ একটি ঘটনার বিবরণ দাও?

প্রশ্ন/৫) নিম্নের বিষয় গুলো সংঘঠিত হওয়ার তারিখ উল্লেখ কর:

১- দারূল আরকাম বিন আবিল আরকাম তথা আরকাম বিন আবুল আরকামের ঘর সাহাবীদের বৈঠকের জন্য নির্বাচন।

২- হাবশাহ্ তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত।

৩- ব্যপক বয়কট।

প্রশ্ন/৬) শুন্য স্থান প রণ কর:

প্রথম দল হাবশা (আবিসিনিয়া) মুখে হিজরত করে নবুয়তের ---------- সনে। আর তারা ছিলেন---------- পুরূষ এবং মহিলা। তাদের নেতা ছিলেন----------। দ্বিতীয়বার যারা হিজরত করেছিলেন তাদের সংখ্যা হল ---------- পুরূষ এবং -------- মহিলা।

প্রশ্ন/৭) নিম্নের বর্ণিত বিষয়গুলির কারণ উল্লেখ কর:

১- প্রথম বার আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের আবসিনিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের কারণ।

২- বাদশাহ নাজ্জাশী কর্তৃক কুরাইশ প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে দেয়া।

৩- হযরত উমার (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ এবং তাকে ফারূক নামে অবিহিত করণ।

৪- আমুল হুয্ন বা "চিন্ ার বছর" নাম রাখার কারণ।

প্রশ্ন/৮) ব্যাপক বয়কটের ধারা গুলি কি কি? উহা কত দিন স্থায়ী ছিল। কে উহা ভেঙ্গে ফেলে এবং এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালায়?

প্রশ্ন/৯) রাস লের (সা:) দ্বিতীয় স্ ী কে ছিলেন?

প্রশ্ন/১০) আল্লাহর দিনের উপর দৃঢ় পদ থাকার এবং ধৈর্য ধারণের কারন সম হ হতে মাত্র চারটি কারন উল্লেখ কর।

প্রশ্ন/১১)নিম্নের বর্ণিত ঘটনা গুলিকে স্বীয় তারিখের সাথে সংযুক্ত কর:

ক)	খ)
-হামযার (রা) ইসলাম গ্রহণ	-নবুওতের৬ষ্ঠ সনের যিলহজ্ব মাসে
-উমার (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ	-নব য়তের দশম সনে
-সাধারণ বয়কোট এর স চনা	-৬ষ্ঠ সনের শেষের দিকে
-আব তালেব এর মৃত্যুবরণ	-৭ম সনের মুহার্‌রম মাসে

মক্কী যুগের তৃতীয় পর্যায়

মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত

তায়েফে আল্লাহ্‌র রস ল ঃ

নবুয়তের দশম বর্ষের শাওয়াল মাসে (৬১৯ ঈসায়ী সালের মে মাসের শেষের দিকে অথবা জুন মাসের প্রথম দিকে) নবী [] তায়েফ গমন করেন। তায়েফ মক্কা থেকে প্রায় ষাট মাইল দ রে অবস্থিত। রাস লুল্লাহ [] যাওয়া-আসার পথ একশত বিশ মাইল দ রত্ব পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছিলেন। আল্লাহর রস লের সাথে তার মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) ছিলেন। তায়েফ যাওয়ার পথে বিভিন্ন কবীলাকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করতো না। তায়েফ পৌছার পর রস লুল্লাহ [] ছাকিফ গোত্রের তিন জন সর্দারের কাছে যান। এরা পরস্পর ভাই। এদের নাম ছিল আবদে ইয়ালিল, মাসউদ এবং হাবিব। এদের পিতার নাম ছিল আমর ইবনে ওমায়ের ছাকাফি। রস লুল্লাহ [] তাদের কাছে পৌঁছার পর তাদেরকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং ইসলামের সাহায্য করার আহবান জানান। কিন্তু তারা তার আহবানে সাড়া দিল না। রস লুল্লাহ [] উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা যা করেছ করেছ, তবে বিষয়টা গোপন রেখো।

রস লুল্লাহ [] তায়েফে দশ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি তায়েফের সকল নেতৃস্থানীয় লোক অর্থাৎ গোত্রীয় সর্দারদের কাছে গমন করেন এবং প্রত্যেককে দ্বীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু সবাই এক কথা বললে যে, তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি বরং উচছৃখল বালকদের উস্কানি দিয়েছিল। তিনি ফেরার সময় ওই সব দুর্বৃত্ত বালক তাঁর পেছনে লেগে গেল। তারা আল্লাহর রস লকে গালাগাল করছিল, হাততালি দিচিছল, হৈ চৈ করছিল। কিছ ক্ষণের মধ্যে এতো বালক এবং দুর্বৃত্ত লোক জড়ো হলো যে, পথের দু'ধারে লাইন লেগে লেগ। এর পর তারা গালাগাল দিতে লাগলো এবং পাথর ছুঁড়তে লাগলো, এতে তাঁর দু'পা রক্তাক্ত হয়ে জুতো রক্তে ভরে গেল। এদিকে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা:) ঢাল হিসাবে প্রিয় নবীকে আগলে রাখছিলেন। ফলে নিক্ষপ্ত ঢিল তাঁর গায়ে পড়ছিল। তাঁর মাথায় কয়েক জায়গায় কেটে গেল। হৈ চৈ করতে করতে দুর্বৃত্তরা আল্লাহর রস লের পিছু নিয়েছিল। এক সময় তিনি মক্কার ওতবা, শায়বা এবং রবিয়াদের একটি বাগানে আশ্রয় নিলেন। এ বাগান ছিল তায়েফ থেকে তিন মাইল দ রে। আল্লাহর রস ল এ বাগানে আশ্রয় নেয়ার পর দুর্বৃত্তদল ফিরে গেল। রস লুল্লাহ [] একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে আঙ্গুর গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন। কিছুটা শান্ত হওয়ার পর দোয়া করলেন। এই দোয়া 'দোয়ায়ে মোসতাযআফিন' নামে বিখ্যাত। এ দোয়ার প্রতিটি শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, তায়েফবাসীদের খারাপ ব্যবহার এবং একজন লোকেরও ঈমান না আনার কারণে রস লুল্লাহ [] কতোটা মনোকস্ট পেয়েছিলেন। তাঁর দু:খ মনোবেদনা ছিল কতো গভীর। এই দোয়ায় আল্লাহর রস ল বললেন,

(**اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ،وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لك يكن بك على غضب فلا أبلي ، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرفت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل على سخطك ، لك العتبي حتى ترضى ، ولا حول ولاقوة إلابك .**)

'হে আল্লাহ পাক, আমি তোমার কাছে আমার দুর্বলতা, অসহায়তা এবং মানুষের কাছে আমার মু ল্যহীনতা সম্পর্কে অভিযোগ করছি। দয়ালু দাতা, তুমি দুর্বলদের প্রভু, তুমি আমারও প্রভু, তুমি আমাকে কার কাছে ন্যস্ করছো? আমাকে কি এমন অচেনা কারো হাতে ন্যস্ করছো যে আমার সাথে রূক্ষ ব্যবহার করবে, নাকি কোন শত্রুর হাতে ন্যাস্ করছো যাকে তুমি আমার বিষয়ের মালিক করে দিয়েছো ? যদি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোন দু:খ নেই আফসোস নেই। তোমার ক্ষমাশীলতা আমার জন্য প্রশস্ ও প্রসারিত করো। আমি তোমার সত্তার সেই আলোর আশ্রয় চাই যা দ্বারা অন্ধকার দ র হয়ে আলোয় চারিদিক ভরে যায়, যা দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয় সংশোধন হয় যে, তুমি আমার ওপর ক্রোধান্বিত হবে অথবা অমাকে ধমকাবে। তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই অমার সকল ক্লান্ি । সকল ক্ষমতা শক্তি শুধু তোমারই। তোমার শক্তি ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই।'

রাবীয়ার পুত্ররা আল্লাহর রস লের অবস্থা দেখে তাঁর প্রতি দয়া পরবশ হলো। নিকটাৰীয়তার কথা ভেবে তাদের মন নরম হয়ে গেল। নিজেদের খৃস্টান ক্রীতদাস আদ্দাসের হাতে এক থোকা আঙ্গুর দিয়ে বলল, লোকটিকে দিয়ে এসো। ক্রীতদাস আদ্দাস আঙ্গুরের থোকা আল্লাহর রস লকে দেয়ার পর তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে খেতে শুরূ করলেন।

আদ্দাস বলল, খাওয়ার সময় এ ধরনের শব্দতো এখানের লোকজনরা বলে না। আল্লাহর রস ল বললেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী? তোমার ধর্ম কি? সে বলল, আমার বাড়ী 'নিনোওয়া'। ধর্ম ঈসায়ী। রস লুল্লাহ বললেন, তুমি পুন্যশীল বান্দা হযরত 'ইউনুস বিন মাত্তা'র এলাকার অধিবাসী। আদ্দাস বলল, আপনি ইউনুস বিন মাত্তাকে কি করে চিনেন? আল্লহর রস ল বললেন, তিনি ছিলেন আমার ভাই। তিনি ছিলেন নবী, আমিও নবী। একথা শুনে আদ্দাস রস লুল্লাহ এর উপর ঝুঁকে পড়লো এবং তাঁর মাথা হাত ও পায়ে চুম্বন করলো।

এ অবস্থা দেখে রবিয়ার দুই পুত্র নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, এই লোক এবার আমাদের ক্রীতদাসের মাথা বিগড়ে দিয়েছে। মনিবদের কাছে ফিরে গেলে তারা আদ্দাসকে জিজ্ঞাসা করলো কিরে কি ব্যাপার? আদ্দাস বলল, আমার বিবেচনায় পৃথিবীতে এই লোকের চেয়ে ভালো লোক আর নেই। তিনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন, যে কথা নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। রবিয়ার পুত্ররা বলল, দেখো আদ্দাস, এই লোক যেন তোমাকে তোমার ধর্ম বিশ্বাস থেকে সরাতে না পারে।

কিছুক্ষন অবস্থানের পর নবী আকরাম বাগান থেকে বেরিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। মানসিকভাবে তিনি ছিলেন বিপর্যস্ । 'ক্বারণে মানাযেল' নামক জায়গায় পৌঁছার পর অল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ:) এলেন, তাঁর সাথে পাহাড়ের ফেরেশতারাও ছিলেন। তারা আল্লাহর রস লের কাছে অনুমতি চাইতে এসেছিলেন যে, যদি তিনি বলেন, তবে এর অধিবাসীদেরকে দু'টি পাহাড়ের মধ্যে পিষে ফেলবেন।

নবী করিম বললেন, না, আমি আশা করি আল্লাহ পাক ওদের বংশধরদের মধ্যে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (সহীহ্ বুখারী)

রস লুল্লাহ এর এই জবাবে তাঁর দুরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, অনুপম ব্যক্তিত্ব, উত্তম মানবিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মোটকথা, আসমানের ওপর থেকে আসা গায়েবী সাহায্যে তাঁর মন শান্ হয়ে গেল। আল্লাহর রস ল মক্কার পথে পা বাড়ালেন। 'ওয়াদীয়ে নাখলা' নামক জায়গায় এসে তিনি থামলেন। সেখানে রস লুল্লাহ কয়েকদিন কাটান। সেখানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন জিনদের দু'টি দল তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। পবিত্র

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟
أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا
سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ
وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟
بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

কোরআনের দুই জায়গায় - স রা আহকাফে এবং স রা জিন-এ এদের কথা উল্লেখ রয়েছে।
''স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে (যারা কোরআন পাঠ শুনছিল। যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হলো, ওরা একে অপরকে বলতে লাগলো, চুপ করে শ্রবণ করো। যখন কোরআন পাঠ সমাপ্ত হলো ওরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল, এক একজন সতর্ককারীরূপে। এমন এক কেতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসার ওপর। এটি প র্ববর্তী বিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। যে আমাদের সম্প্রদায়, আমাদের দিকে আহবানবারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ পাক তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।'' (স রা আহক্বাফ ২৯-৩১)

স রা জিন-এ আল্লাহ পাক বলেন,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ
فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾

'বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে (এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করব না।' স রা জিন-এর পনেরটি আয়াত পর্যন্ত এই বর্ণনায় রয়েছে।)
উল্লেখিত আয়াত সম হের বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ প্রথম দিকে জিনদের আসার কথা জানতেন না। কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে জানানোর পর আল্লাহর রস ল এ সম্পর্কে অবহিত হন। কোনআনের **আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, এটা ছিল জিনদের প্রথম আগমন। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, পরবর্তী সময়ে তাদের যাতায়াত চলতে থাকে।**

জিনদের আগমন এবং ইসলাম গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে অল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল দ্বিতীয় সাহায্য। আল্লাহ পাকের অদৃশ্য ভান্ডার থেকে তিনি এ সাহায্য লাভ করেন। এ ঘটনা বর্ণনা সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রস লকে দ্বীনী দাওয়াতের সাফল্যের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং একথা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবীর কোন শক্তিই দ্বীন ইসলামের দাওয়াতের সাফল্য ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে টিকতে পারবে না।

এই সাহায্য এবং সুসংবাদের সামনে তায়েফের খারাপ ব্যবহারজনিত দু:খ কষ্ট, মনের কালো মেঘ দূর হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রস ল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে, মক্কায় তাঁকে ফিরে যেতে হবে এবং নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে।

রস লুল্লাহ ﷺ নাখলা থেকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কার অদূরে হেরা গুহায় অবস্থান করলেন। সেখান থেকে খোজায়া গোত্রের একজন লোকের মাধ্যমে আখনাস ইবনে শোরাইককে এ পয়গাম পাঠালেন যে, আখনাস যেন তাঁকে আশ্রয় দেয়। আখনাস অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। আল্লাহর রস ল এরপর সোহায়েল ইবনে আমরের কাছেও একই পয়গাম পাঠালেন। কিন্তু সেই লোকও অক্ষমতা প্রকাশ করলো। এরপর আল্লাহর রস ল মোতয়াম ইবনে আদীর নিকট পয়গাম পাঠালেন। মোতয়াম বললেন, হ্যাঁ, আমি রাজি আছি মোহাম্মদ ﷺ কে আশ্রয় দিতে। এরপর মোতয়াম আল্লাহর রস লকে খবর পাঠালেন যে, আপনি মক্কার ভেতরে আসুন। রস লুল্লাহ ﷺ খবর পাওয়ার পর যায়েদকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। মোতয়াম ইবনে আদী তাঁর সওয়ারীর ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন

যে, কোরায়েশের লোকেরা শোনো, আমি মোহাম্মদ কে আশ্রয় দিয়েছি। কেউ যেন এর পর তাঁকে বিরক্ত না করে। রস লুল্লাহ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। নামায আদায়ের পর তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। এ সময় মোতয়াম ইবনে আদী এবং তার সন ানেরা অস সজ্জিত হয়ে রস লুল্লাহ কে ঘিরে রাখলো। আল্লাহর রস ল ঘরে ফিরে যাওয়া পর্যন তারা তাঁর সঙ্গে ছিল।

রস লুল্লাহ (সা:) মোতয়াম ইবনে আদীর এ উপকার কখনো ভোলেন নি। বদরের বন্দীদের ব্যাপারে তিনি বলেন, মোতয়াম ইবনে আদী যদি আজ বেঁচে থাকতো এবং আমার কাছে এসব দুর্গন্ধময় লোকদের ব্যাপারে সুপারিশ করতো তবে তার খাতিরে আমি এদের সবাইকে মুক্ত করে দিতাম।

প্রশ্নমালাঃ

১) রাস লুল্লাহ্ দাওয়াতী কাজে কখন তায়েফ অভিমুখে রাওয়ানা হন ? সে সময় তাঁর সাথে কে ছিলেন ?

২) তায়েফবাসীদের দাওয়াত দিতে নবী কত দিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন ? তাদের কেহ কি তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিল ?

৩) পাহাড়ের ফেরেস া কেন রাস লুল্লাহ্ এর নিকট এসেছিলেন? জবাবে রাস লুল্লাহ্ কি বলেছিলেন?

৪) আল্লাহ্ তাআলা তার নবী কে অদৃশ্য সাহায্য দ্বরা শক্তিশালী করেছিলেন, সে সাহায্যটি কি ছিল?

৫) রাস লুল্লাহ্ যখন মক্কায় ফিরে এলেন তখন তাকে কে আশ্রয় দিয়েছেল ?

বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তির নিকট ইসলামের দাওয়াতঃ

নবুয়তের দশম বর্ষের জিলক্বদ মাসে (অর্থাৎ ৬১৯ ঈসায়ী সালের মে মাসের শেষে বা জুনের প্রথম দিকে) রাস লুল্লাহ্ তায়েফ থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। মক্কায় আসার পর তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোত্রের নিকট নতুন উদ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরূ করেন। এ সময় হজ্জের মৌসুম হওয়ায় দ র নিকট সর্বত্র থেকে পায়ে হেঁটে এবং সওয়ারীতে আরোহণ করে বহু লোক হজ্জ পালনের জন্য আসেন। নবী করিম (সা:) এ সময় গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। নবুয়তের চতুর্থ বছর থেকে তিনি এ ধরনের দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন। রাস লুল্লাহ্ রাত্রিবেলা দাওয়াতী কাজে বের হতেন, যাতে করে কোন মুশরিকেরা তাঁর কাজে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। একদা রাত্রে হযরত আবু বকর ও আলী (রাঃ)কে সাথে নিয়ে বের হলেন এবং ইয়াসরেব থেকে হজ্জে আসা ছয় জন যবুকের কাছে গেলেন। তারা সবাই খাজরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলে তারা দ্রুত সে দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন। এরা যখন ইসলামের বাণী নিয়ে ইয়াসরেব ফিরে গেলেন তখন সেখানের সব বাড়ীতেই রাস লুল্লাহ্ বএর কথা আলোচিত হতে লাগল।
ইমাম যুহরী বলেন, রাস লুল্লাহ্ যে সকল গোত্রের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন তারা হচেছ, বনু আমের ইবনে সাআসাআ, মোহারেব ইবনে খাছব, ফাজারাহ, নাস্সান, মায়রা, হানিফা, ছালিম, আবাস, বনু নছর, বনু আলবাকা, কেলাব, হারেছ ইবনে কা'ব আযারাহ, হাযারেমা। কিন্তু এসব গোত্রের মধ্যে কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি।

হযরত আয়েশার সাথে বিয়েঃ
সেই বছরেই অর্থাৎ নবুয়তের একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাসে রস লুল্লাহ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহার) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত আয়েশার বয়স ছিল তখন ছয় বছর। হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রা:) স্বামী গৃহে গমন করেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।

মেরাজ-এর ঘটনাঃ
মেরাজ কবে সংঘটিত হয়েছিল এ সম্পর্কে সীরাত রচয়িতাদের মতামতের বিভিন্নতা রয়েছে।
এক) তিবরানী বলেছেন, যে বছর নবী কে নবুয়ত দেয়া হয় সে বছরই ঘটেছিল মেরাজের ঘটনা।
দুই) ইমাম নববী এবং ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, নবুয়তের পাঁচ বছর পর।
তিন) হিজরতের ১৬ মাস আগে অর্থাৎ নবুয়তের দ্বাদশ বছরে রমযান মাসে।
চার) নবুয়তের দশম বর্ষে ২৭শে রজব তারিখে। আল্লামা মনসুরপুরী এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।
পাঁচ) হিজরতের এক বছর দুই মাস আগে অর্থাৎ নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে মুহার্রম মাসে।
ছয়) হিজরতের এক বছর আগে অর্থাৎ নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষের রবিউল আউয়াল মাসে।

হাদীসবেত্তাগণ এঘটনার বিবরণ বিস্ ারিত ভাবে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে উহা উল্লেখ করলামঃ
ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, নবী কে স্বশরীরে বোরাকে তুলে হযরত জিবরাঈল (আ:)-এর সঙ্গে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মাকদেস পর্যন্ ভ্রমণ করানো হয়। এরপর প্রিয় নবী সেখানে যাত্রা বিরতি করেন এবং সকল নবীর ইমাম হয়ে নামায আদায় করেন। মসজিদের দরজার খুঁটির সাথে বোরাক বেঁধে রাখেন।

এরপর সেই রাতেই তাঁকে বায়তুল মাকদেস থেকে প্রথম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত জিবরাঈল (আ:) দরজা খোলেন। প্রিয় নবী সেখানে হযরত আদমকে দেখেন । সে সময় আল্লাহ পাক হযরত আদমের (আ:) ডান দিকে নেককারদের এবং বামদিকে **পাপীদের রূহ নবী কে দেখান। এরপর তিনি দ্বিতীয় আসমানে যান। প্রিয় নবী**

সেখানে হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ:) এবং হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ:)কে দেখেন। এরপর নবী তৃতীয় আসমানে যান। সেখানে ইউসুফ (আ:) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রিয় নবী (সা:)কে এরপর চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি হযরত ইদরীস (আ:)-কে দেখেন।

এরপর তাকে পঞ্চম আসমানে নেয়া হয়। সেখানে তিনি হযরত হারূন (আ:) -কে দেখেন। প্রিয় নবী (সা:)-কে এরপর নেয়া হয় ষষ্ঠ আসমানে। সেখানে হযরত ম সা (আ:)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। নবী সামনে অগ্রসর হলেন, এ সময় হযরত ম সা (আ:) কাঁদতে লাগলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, একজন নবী যিনি আমার পরে আবির্ভ ত হয়েছেন তাঁর উম্মতেরা আমার উম্মতদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী বেহেশতে যাবে। প্রিয় কে এরপর নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আসমানে। সেখানে হযরত ইবরাহীমের (আ:) সাতে তার দেখা হয়। উল্লেখিত নবী (আঃ)দের প্রত্যেকেই তাঁকে সালাম করেন। তাঁরা সকলেই তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দেন।

প্রিয় নবীকে এরপর সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আল্লাহ পাকের এতো কাচাকাছি পৌছেন যে, উভয়ের মধ্যে দুটি ধনুক বা তারও কম ব্যবধান ছিল। সেই সময় আল্লাহ পাক তার যা কিছু দেয়ার দিয়ে দেন, যা ইচছা ওহী নাযিল করেন এবং পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। ফেরার পথে হযরত মুসার (আ:) সাথে দেখা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ পাক আপনাকে কি কাজের আদেশ দিয়েছেন? নবী (সা:) বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। হযরত ম সা (আ:) বললেন, আপনার উম্মত এতো নামায আদায় করার শক্তি রাখে না। আপনি আল্লাহ পাকের কাছে ফিরে যান এবং নামায কমিয়ে দেয়ার আবেদন করুন। নবী (সা:), হযরত জিবরাঈল (আ:)-এর দিকে তাকালেন, তিনি ইশারা করলেন। এরপর ফিরে গিয়ে নামাযের সংখ্যা কমিয়ে দেয়ার আবেদন জানালেন। হযরত ম সার (আ:) সাথে আবার ফেরার পথে দেখা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ পাকের নিকট থেকে কি আদেশ নিয়ে যাচেছন? হযরত ম সা (আ:) পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামাযের কথা বললেন। হযরত ম সা (আ:) বললেন, আপনি ফিরে যান, এমনি করে বারবার ফিরে যাওয়ায় এবং নামায কম করার হার একপর্যায়ে নামাযের সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও হযরত ম সা (আ:) বেশী মনে করলেন এবং আরো কমিয়ে আনার আবেদন জানানোর জন্য ফিরে যেতে বললেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্ ফা আহমদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে, আমি আর যেতে চাই না। আমি আল্লাহ পাকের এই আদেশের ওপরই মাথা নত করলাম।

আল্লামা ইবনে কাইয়েম এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, নবী কি আল্লাহ পাককে দেখেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, চোখে দেখার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কোন সাহাবী এ কথা বর্ণনাও করেননি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে সাধারণভাবে চোখে দেখার এবং অন্ র দ্বারা দেখার যে কথা উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম বর্ণনা দ্বিতীয় বর্ণনার বিপরীত নয়। নবী (সা:) হযরত জিবরাঈলকে তার আসল চেহারায় দু'বার দেখেছেন। একবার পৃথিবীতে এবং অন্যবার সিদরাতুল মুনতাহার কাছে।
এ সময়েও প্রিয় নবীর 'শাককুস সদর' বা বক্ষ বিদিরণের ঘটনা ঘটেছিল। এ সফরের সময় তাঁকে কয়েকটি জিনিস দেখানো হয়েছিল। তাঁকে দুধ এবং মদ দেয়া হয়েছিল। তিনি দুধ গ্রহণ করলেন। এটা দেখে হযরত জিবরাঈল (আ:) বললেন, আপনাকে ফেতরাতের বা স্বভাবের পথ দেখানো হয়েছে। যদি আপনি মদ গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।
আল্লাহর রস ল ৪টি নহর দেখলেন। ৪টি যাহেরী(প্রকাশ্য) আর ৪টি বাতেনী (অপ্রকাশ্য)। প্রকাশ্য নহর ছিল নীল এবং ফারাত। এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, তার রেসালত নীল এবং ফোরাতের সজীব এলাকা সম হে বিস্ ার লাভ করবে। অর্থাৎ এখানের অধিবাসীরা বংশ পরম্পরায় মুসলমান হবে। এমন নয় যে, এদু'টি নহরের পানির উৎস জান্নাতে রয়েছে।

জাহান্নামের দারোগা মালেককে তিনি দেখলেন। তিনি হাসেন না, তার চেহারায় হাসি খুশীর কোন ছাপ নেই। নবী কে বেহেশত এবং দোযখও দেখানো হলো।

এতিমের ধনসম্পদ যারা অন্যায়ভাবে আৱসাৎ করে নবীকে তাদের অবস্থাও দেখানো হয়। তাদের ঠোঁট ছিল উটের মত। তারা নিজেদের মুখে পাথরের টুকরোর মতো অঙ্গার প্রবেশ করাচ্ছে সেই অঙ্গার তাদের গুহ্যদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।
নবী (স:) সুদখোরদেরও দেখেছিলেন। তাদের পেট এত বড় ছিল যে, সে স্থান থেকে অন্য স্থানে নড়াচড়া করতে পারছিল না।
ব্যভিচারী প রূষ এবং নারীদের দেখানো হয়েছিল। তাদের সামনে তাজা গোশত এবং দুর্গন্ধময় পচা গোশত ছিল, তারা তাজা গোশত রেখে পচা গোশত খাচিছল।
যেসব বিবাহিতা স্বামী থাকা সত্ত্বেও নিজের গর্ভে অন্য পুরূষের সন্ ান ধারণ করেছিল প্রিয় নবী তাদেরও দেখেছেন। নবী লক্ষ্য করলেন যে, ওসব মহিলার বুকে বড় বড় কাঁটা বিধিয়ে তাদেরকে শ ন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

সকাল বেলায় নবীজী মেরাজের ঘটনা সম্পর্কে লোকদের খবর দিলে তার প্রতি কাফেরদের ঘৃণা আরো বেড়ে গেল এবং তাঁর কথা মেনে নিতে তারা অস্বীকৃতি জানালো। তারা দাবী জানালো তাদের সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা পেশ করা হোক। আল্লাহ তখন তার চোখের সামনে উহা পেশ করলেন, তিনি উহা দেখে দেখে বলে দিলেন।
বলা হয় হযরত আবু বকর সিদ্দীককে নবীজী সেই সময়ই সিদ্দীক উপাধি দিয়েছিলেন। কেননা অন্য সবাই যখন অবিশ্বাস করেছিল তিনি তখন সব কিছু বিশ্বাস করেছিলেন।

মেরাজের বিবরণ আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে উল্লেখ করেছেন।
এই সফরের কারণ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ
(لنريه مـــن آياتنـــا) ''যাতে করে তাকে আমি আমার নিদর্শন সম হ প্রত্যক্ষ দেখাই।'' (স রা বানী ইসরাঈল-১)
এসব দেখানোর উদ্দেশ্য হচেছ তিনি যেন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন। ফলে তিনি আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে গিয়ে এমন সব দু:খ কষ্ট নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে পারেন যা সহ্য করা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।
এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আল্লাহ পাক কোরআনে মাত্র একটি আয়াতে মেরাজের ঘটনা উল্লেখ করেই ইহুদীদের দুস্কৃতির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর তাদের জানিয়েছেন যে, এই কোরআন সেই পথেরই হেদায়াত দিয়ে থাকে যে পথ সঠিক এবং সরল। কোরআন পাঠকারীদের মনে হতে পারে যে, উভয় কথা সম্পর্কহীন, কিন্তু আসলে তা নয়। আল্লাহ পাক তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে এই ইশারাই দিয়েছেন যে, এখন থেকে ইহুদীদের মানব জাতির নেতৃত্বের যোগ্যতা তাদের আর নেই। কাজেই এই দায়িত্ব ও মর্যদা এখন থেকে মহানবীকে প্রদান করা হবে এবং দু:সাহসী দাওয়াতের উভয় কেন্দ্রকে তাঁর নিয়ন্ ণাধীন করা হবে। অন্য কথায় বলা যায় যে রূহানী নেতৃত্ব এক উম্মত থেকে অন্য উম্মতের কাছে স্থানান্ র করা হবে।
কিন্তু এই নেতৃত্বের প র্ণতা কিভাবে সাধিত হবে? ইসলামের নবী তো মক্কার পাহাড়ে লোকদের কাছে ঘুরে বেড়াচেছন। এটি একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্ন অন্য একটি সত্যের পর্দা উম্মোচন করছে। ইসলামের দাওয়াত একটা পর্যায় অতিক্রম করার কাছে পৌঁছেছে, বর্তমানে অন্য একটি পর্যায়ে প্রবেশ করবে। এই ধারা হবে অন্য ধারা থেকে ভিন্ন। এ কারণে দেখা যায় যে, কোন কোন আয়াতে পৌত্তলিকদের সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং কঠোর হুমকি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন,
'আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَـٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। তারপর তাদের প্রতি দন্ড প্রদান ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি সেটা সম্প র্ণরূপে বিধ্বস্ করি।' (স রা বনি ইসরাঈল, - ১৬)
আল্লাহ পাক উক্ত স রায় আরো বলেন,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

'ন হের পর আমি কতো মানব গোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তোমার প্রতিপালকই তার বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।' (স রা বনি ইসরাঈল, - ১৭)
এ সকল আয়াতের পাশাপাশি এমন কিছু আয়াতও রয়েছে, সে সব আয়াতে মুসলমানদের ভবিষ্যত ইসলামী সমাজের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। তারা এমন এক ভূখন্ডে নিজেদের ঠিকানা তৈরী করেছে যেখানে সবকিছু তাদের নিজের হাতে ন্যস্ । উল্লিখিত আয়াতে এমন ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহর রস ল শ্রীঘ্রই এমন নিরাপদ জায়গা পেয়ে যাবেন যেখানে দ্বীন ইসলাম যথাযথভাবে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে প্রচার ও প্রসার লাভ করবে।

প্রথম বাইয়াতে আকাবাঃ
ইতিপ র্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবুয়তের দশম বর্ষে হজ্জ মওসুমে ইয়াসরেবের ছয়জন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা আল্লাহর রস লের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে তারা নবীজীর রেসালাতের তাবলীগ করবেন।
এর ফলে পরবর্তী হজ্জ মওসুমে ১২জন লোক রস লের কাছে আসেন। এদের মধ্যে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ছাড়া অন্য ৫ জন ছিলেন তারা, যারা গত বছর এসেছিলেন।

এরাসবাই মিনায় আকাবার কাছে আল্লাহর রস লের নিকট কয়েকটি বিষয়ে বাইয়াত নেন। পরবর্তী সময়ে হোদাবিয়ার সন্ধির পর এবং মক্কা বিজয়ের সময়ে এইসব কথার ওপরেই মহিলাদের নিকট থেকেও বাইয়াত গ্রহণ করা হয়।
আকাবার এই বাইয়াতের বিবরণ বোখারী শরীফে ওবাদা ইবনে সামেতের (রাঃ) বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহর রস ল ﷺ বলেছেন, 'এসো আমার কাছে এ মর্মে বাইয়াত করো যে, তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজের সন্ তানদেরকে হত্যা করবে না, মনগড়া কোন অপবাদ কারো ওপর দেবে না, ভালো কাজে আমার অনুসরণ করবে, কোন প্রকার অবাধ্যতা করবে না। যে ব্যক্তি এসব কিছু পালন করবে তার পুরস্কার আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে, যে ব্যক্তি এসব বিষয়ের কোন কিছু অমান্য করবে, যদি তাকে সেই অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেয়া হয় তবে তার শাস্তি তার পাপের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। যদি কেউ অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তার পাপ গোপন রাখেন তাহলে তার কাজের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছে করলে শাস্তি দেবেন ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দেবেন।
হযরত ওবাদা বলেন, এসব বিষয়ে আমরা আল্লাহর রস লের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করলাম। (বুখারী)

মদীনায় রস লের দ তঃ
বাইয়াত শেষ হয়ে গেল এবং হজ্জের মওস ম শেষ হলো। আল্লাহর রস ল ﷺ বাইআত গ্রহণকারীদের সাথে মদীনায় তাঁর প্রথম দ ত পাঠালেন। মুসলমানদের ইসলামের শিক্ষা প্রদান এবং যারা এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত প্রদানই ছিল এই দ ত প্রেরণের উদ্দেশ্য। প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী যুবক মুসআব ইবনে ওমায়েরকে (রা:) আল্লাহর রস ল মদীনায় প্রেরণ করেন।

হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রা:) মদীনায় পৌঁছার পর হযরত আসআদ ইবনে যুরারার (রা:) ঘরে অবস্থান করেন। এরপর উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উভয়ে মদীনাবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরূ করেন। এ সময় হযরত মুসআব 'মুক্বরি' উপাধি লাভ করেন। এ শব্দের অর্থ হচ্ছে শিক্ষক বা মোয়াল্লেম।

ইসলামী দ তের ঈর্ষণীয় সাফল্যঃ

দ্বীনের তাবলীগ করার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের একটি বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে। আবদুল আশহাল গোত্র থেকে সা'দ ইবনে মুআয এবং উসাইদ ইবনে হুযাইরের ইসলাম গ্রহণ। তাঁরা উভয়ে স্বীয় গোত্রের নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সা'দ নিজের গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গেলেন। লোকেরা বলল, আপনি ভিন্ন চেহারায় ফিরে এসেছেন মনে হচ্ছে। হযরত সা'দ বললেন, তোমরা আমাকে কেমন লোক মনে করো হে, বনি আবদুল আশহাল? সবাই বলল আপনি হচেছন আমাদের নেতা। বুদ্ধি-বিবেচনার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে বেশী। সা'দ ইবনে মুআয বললেন, আচ্ছা তবে শোনো, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ আল্লাহ রব্বুল আলামীন এবং তাঁর প্রিয় রস লের ওপর ঈমান না আনবে ততক্ষণ পর্যন্ তোমাদের সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম। বিকেল পর্যন্ গোত্রের নারী পুরূষ সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন। উসাইরিম নামে একজন লোক সে সময় ঈমান আনেননি। তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে অংশ নিয়ে শহীদ হন। তিনি কোন নামায আদায় করেননি। আল্লাহর রস ল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, অল্প আমল করে সে অনেক বেশী পুরস্কার পেয়েছে।

পরবর্তী হজ্জ মৌসুম আসার আগে অর্থাৎ নবুওতের ত্রোয়দশ বছরে হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রা:) সাফল্যের সুসংবাদ নিয়ে আল্লাহর রস লের নিকট মক্কায় হাযির হন। তিনি প্রিয় রস লের ﷺ নিকট ইয়াসরেবের গোত্র সম হের অবস্থা, তাদের যূদ্ধ করার ও প্রতিরক্ষার কৌশল এবং অন্যান্য যোগ্যতা সম্পর্কে বিস্ ারিত তথ্য পেশ করেন।

==সমাপ্ত ==